Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 294 - 309
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি : প্রেক্ষিত রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প

অপূর্ব রায়
গবেষক
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় (আসানসোল)
Email ID : rapurba26@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Indigenous people, superstition, population, India, lifestyle, culture, exploitation, Munda, famine, crisis.

Abstract
Every tribal people have been trying to survive on their own since the beginning of human civilization. They consider agriculture as an integral part of their lives along with forest products collection and animal husbandry. They mainly contribute to the economic development of India through paddy production. Apart from paddy, they are seen to earn their living by producing other crops. But their plight in the agricultural economy is Nothing has changed. At the same time, the landlords were close to the state power. They have been oppressed repeatedly. Storyteller Rama pad Chowdhury tells the story of these oppressed indigenous peoples. He highlighted social culture in several of his stories. The story shows the story of tribal women becoming sex workers due to poverty and hardship. In addition, tribal people are seen to have traditional beliefs about ancient customs, superstitions. For example, they take people with family illnesses, dog bites, snake bites to a shaman or a poet to get rid of the poison. Again, an Englishman is seen coming forward to express his sympathy for their society or to save a woman from the clutches of the society's elite. At one time, all the people of a hard-working tribal village became beggars. Some Englishmen convert indigenous women to Christianity and marry them, or keep their indigenous religion intact and take women as wives. However, in most of his stories, Rama pad Chowdhury highlights the issue of women being molested and looked down upon by outside men, either in the story's explanation or in the narration.

Discussion

‘আদিবাসী’ অর্থে বোঝায় প্রথম ও প্রকৃত অধিবাসী। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়, ধর্মবিশ্বাসে, রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠানে, বিশ্বাস-সংস্কারে যারা স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তারাই আদিবাসী। এঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনবিন্যাস পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানের এবং অকৃত্রিম সারল্যে, বাহুল্যবর্জিত অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে (common geographical area) জনজাতি সংস্কৃতির মানুষ বসতি নির্মাণ করেন এবং একই ভাষায় (a similar

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

language) ভাবের আদানপ্রদান করেন; এমনকি প্রতিদিনের সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও অভ্যস্ত আচরণে (culture or beliefs and practices) জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা কর্তৃক গৃহীত ১৬৯ নম্বর কনভেনশনের ১ নম্বর আর্টিকেলে 'আদিবাসী' বা 'আদিনৃগোষ্ঠী'র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

1. Tribal people independent countries (are those) whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections or the sections or the national community and those status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.
2. People in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabitated [sic] the country belongs, at the time of conquest of colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.[১]

আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ট্রাইব শব্দের নানারকম অর্থ পরিভাষা হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে।

এই পরিভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-'আরণ্যক', 'পাহাড়িয়া', 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'আদিমজাতি', 'খণ্ডজাতি', 'ভূমিপুত্র', 'গিরিজন', 'জনজাতি'। এই শব্দগুলির পাশে আরেকটি শব্দ গৃহীত হতে পারে, সেটি হলো 'প্রাকৃতজন'। লক্ষণীয় প্রতিটি পরিভাষার অন্তরালে রয়েছে গভীর আর্থ-সমাজ-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। সভ্যতা সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে যে মানুষগুলি অরণ্যচারী জীবন গ্রহণ করেছিল তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্যে 'আরণ্যক' শব্দটির ভিন্ন আর এক তাৎপর্য রয়েছে। এই মানুষগুলি অরণ্যনির্ভর জীবনযাপন করতেন। অরণ্য যাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন তারাই চিহ্নিত হয়েছেন 'আরণ্যক' নামে। 'পাহাড়িয়া' শব্দটির মধ্যে রয়েছে অনুরূপ ব্যঞ্জনা। এই মানুষগুলি গিরিকন্দরে তাদের গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। খাদ্যান্বেষণে বেড়িয়ে তারা পশু শিকার করেছেন, ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। তাই তারা 'পাহাড়িয়া'।

আদিম মানুষগুলি ভারতবর্ষের প্রকৃত মানুষ। এদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় এরাই হলেন ভারতবর্ষের আদি মানুষ; এই অর্থে এরা 'আদিবাসী'। ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা ক্রমাগত গভীর অরণ্য জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তারা মূল ভারতীয় সমাজ থেকে দূরে অবস্থান করেছেন। উপ অর্থে মূলের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই তারা হলেন 'উপজাতি'। আর্যদের প্রবেশের পূর্বে প্রাগাধুনিক সেই সভ্যতার মানুষগুলি যেসব জীবন, জীবিকা বেছে নিয়েছিলেন তার মধ্যে রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির মূল শিকড়, তাই এঁরা 'আদিমজাতি' নামেই পরিচিত।

মানবসভ্যতার সমাজ সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আদিম জাতিগোষ্ঠী মূলত মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, ওরাওঁ, ভূমিজ, শবর, লোধা, খেড়িয়া, মালপাহাড়িয়া, ডোম, বাউরি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের বাসস্থান হয়ে উঠেছিল অরণ্য। এখানে গোষ্ঠীবদ্ধ বা দল বেঁধেই এদের অবস্থান। পরবর্তীকালে আর্য জাতিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে এরা অরণ্য কিংবা বন-জঙ্গলকে নিরাপদ ভেবে আশ্রয় নেয়। প্রথমে এরা আর্য জাতি দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে খণ্ড খণ্ড জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। আর এখান থেকেই এদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু হয়। এই আদিম তথা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা আজও অবহেলা, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার যন্ত্রণা ভোগ করে আসছে। উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা অবহেলা বা তাচ্ছিল্য পাওয়ার জন্যই এরা আজও পিছিয়ে। এদের জন্য ঘোষিত সরকারি নানা সংরক্ষণ প্রথা কিংবা আদিবাসীদের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সর্বদা চাহিদার তুলনায় অপূর্ণ থেকে যায়। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে কোনোরকম উন্নয়ন হতে দেখা যায় না। এ সম্পর্কে স্মরজিৎ জানা লিখেছেন -

> "...কিছু সম্পদ বিতরণের রাস্তায় যদি উন্নয়নের 'দেখা মিলত' তাহলে গত ৬০ বছরে আদিবাসীদের উন্নয়ন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি হওয়ার কথাও নয় বলে। যে জনগোষ্ঠীকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> সুকৌশলে সমাজের সীমান্তে ঠেলে রাখা হয়েছে; সে জায়গার বদল না ঘটিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। আসলে প্রশ্নটা উন্নয়নের মতাদর্শকে ঘিরে। সেখান থেকে শুরু করলে উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং রণকৌশল এক নতুন আঙ্গিকে দেখা বোঝা বা গড়ে তোলা যাবে। তাই যতক্ষণ না উন্নয়নের প্রক্রিয়া-প্রকরণ আদিবাসীদের সীমান্তে ঠেলে রাখার বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ঝুটি ধরে টান দিতে পারছে ততক্ষণ উন্নয়ন অধরাই থেকে যাবে।"[২]

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের অরণ্যকূল জীবন যাপন হওয়ায় বেঁচে থাকতে প্রতিনিয়ত তাদের প্রকৃতির সঙ্গেও লড়াই করতে হতো। পূর্বপুরুষানুক্রমে প্রচলিত প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পরব এবং সংস্কার, কুসংস্কারের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল তাদের। একদিকে যেমন দুমুঠো খাদ্যের সংগ্রহের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হতো তেমনি ঝড়-বৃষ্টি দাবানল প্রভৃতির থেকেও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে হতো। ফলস্বরূপ খাদ্য সংকটে শিশুদের দেখা দিত অপুষ্টি, নানান রোগ সেইসঙ্গে মহামারী। খাদ্য সংকটে একসময় তারা জীবিকার সন্ধানে কৃষিকাজ, সস্তা শ্রমিকের কুলি-কামিন, মজুর-মজুরিণী রূপে কর্মে লিপ্ত হতে থাকে। বিভিন্ন খনি অঞ্চলে বিশেষত কয়লাখনি ও চা-বাগানের কুলি-কামিনের শ্রমিক, ইট ভাটার শ্রমিক রূপে জীবিকার পথ খুঁজে নেয়। তাদের শ্রমদানে রেললাইন স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। অথচ দিনের পর দিন ঠিকাদার বা মালিকের তারা বঞ্চনার শিকার হয়েছে এরা। মজুরি না পেয়ে কিংবা কাজ হারিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। বিশেষ করে একমুঠো অন্যের জন্য খ্রিস্টান ধর্ম বা মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হয়েছে একাধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে। ফলে এই আদিবাসীদের বঞ্চনা, জীবন যন্ত্রণা যুগ যুগ ধরে একই ভাবে চলে এসেছে কিংবা এখনো চলছে। অথচ আদিবাসী এলাকার উন্নয়নের জন্য ভারতের সংবিধানের ৩৩৯ তম ধারাতে বলা হয়েছে যে -

> "ভারত সরকার তপসিলী এলাকা ও তপসিলী উপজাতিদের কল্যাণের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতি দশ বছর অন্তর একটি কমিশন নিয়োগ করে ঐ সমস্ত এলাকা ও উপজাতিদের উন্নয়ন ও শাসন সম্পর্কিত অবস্থার কথা প্রতিবেদন মারফত জানতে চাইবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাবলে বিভিন্ন প্রদেশের সরকারগুলিকে নির্দেশ দিতে পারেন, তপসিলী উপজাতি ও তপসিলী এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য।"[৩]

ভারত সরকার এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নানান সুযোগ সুবিধার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনে পেরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। যদিও সেই সুযোগ সুবিধা সবটুকু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারে না। ফলস্বরূপ বঞ্চিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের জীবন যন্ত্রণার প্রসঙ্গ কথা তুলে ধরতে কলম হাতে তুলে নিতে হয় সাহিত্যিকদের। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, অনিল ঘড়াই, সুধীর করণ প্রমুখ সাহিত্যিকরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যন্ত্রণা যেভাবে কথাসাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন ঠিক একইভাবে রমাপদ চৌধুরীর একাধিক গল্পে উঠে এসেছে নানা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যন্ত্রণার বাস্তবিক ইতিহাস।

স্বাধীনোত্তর বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্বার্থক লেখকরূপে পরিচিত হয়ে আছেন সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী। একেবারে জনসামখ্যের প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসা ও কমকথা বলা মানুষটিকে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সেভাবে না চিনলেও কথাসাহিত্যে প্রিয় পাঠকরা তার সাহিত্যের সৃষ্টির নব নব ঐতিহ্যকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন সর্বাগ্রে। ভ্রমণপিপাসু রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্য বিপুল পরিমাণ না হলেও তার রচিত মানুষ ও সমাজের বাস্তব জীবনের এক এক চরিত্রের মনের চোরাগলির পথ সহজেই পাঠকের মনে দাগ কাটিয়ে দিয়ে যায়। যে দাগ আমাদের জনসমাজে বসবাসকারী আমাদেরই বন্ধু স্বজনদের কলরবের চিহ্নিত দাগ। রমাপদ চৌধুরী ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। খড়্গপুরে তার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে, কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই রমাপদ লেখা লেখি শুরু করলেও, বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে মাত্র ২৫ বছর বয়সে

প্রথম ছোটগল্প রচনা করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে রমাপদচৌধুরী যেমন শিক্ষা ও সংস্কার পেয়েছিলেন তেমনি পেয়েছিলে শারীরিক গঠন, মেধা ও মনন। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে রমাপদ তিন মাস ধরে মুরী, রাঁচি, রামগড়, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, আরগাড়া, রেলিগাড়ার কয়লাখনি, খালারির চুনের পাহাড় যেমন দেখলেন তেমনি আদিবাসী উপজাতি ফিরিঙ্গি যুবক-যুবতী প্রবাসী বাঙালিও মার্কিন সৈন্যদেরসম্পর্কে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন।

ভ্রমণপিপাসু রমাপদ চৌধুরী বেড়ানোর সূত্রে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন রাঁচি, হাজারীবাগ, পালামৌ ইত্যাদি আদিবাসী জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে। খুব কাছ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মুন্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের জনজীবনকে। তাদের প্রাত্যহিক জীবন, আচার-আচরণ, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, প্রথা ইত্যাদি রূপ পেয়েছে তাঁর আদিবাসী জীবননির্ভর গল্পগুলিতে। কয়লাখনি অঞ্চল, দেহাতী মানুষ, কুলি-কামিন ইত্যাদির পাশাপাশি এই গল্পগুলিতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা দেশী খৃষ্টান চরিত্রেরও দেখা মেলে। গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা, কুৎসিত নৃশংসতা, নোংরামি, অভদ্রতা, ইতরতা, অশ্লীলতা, তন্ত্র-মন্ত্রে অন্ধবিশ্বাস ডাইনি বিশ্বাস এসব কিছুই আদিবাসী জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য তাদের ঠেলে দিয়েছে গভীর অন্ধকারে। আপাতসভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে অবস্থানরত পিছিয়ে থাকা এই জনজীবনকে রমাপদ চৌধুরী তাঁর আদিবাসী জনজীবননির্ভর গল্পগুলিতে রূপ দিলেন নব কলেবরে। ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আদিবাসী সমাজের জীবন সংগ্রাম যেভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল স্রোতের ধারায় আবারো তার সার্থক প্রকাশ ঘটলো রমাপদ চৌধুরীর একাধিক গল্পে। তাঁর আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতিমূলক গল্পগুলি আদিবাসী সমাজের জীবন ও সংকট বাস্তবিক চিত্র ফুটে উঠেছে কাহিনী ও চরিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে। গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল -

> ‘জলরঙ’ (১৯৫১), ‘দরবারী’ (১৯৫১), ‘লাটুয়া ওঝার কাহিনী’ (১৯৫২), ‘বিবিকরজ’ (১৯৫২, রেডিওতে পড়া গল্প), ‘রেবেকা সোরেনের কবর’ (১৯৫৩), ‘সতী ঠাকুরুনের চিতা’ (১৯৫৩, ১৩৬৪ সালে আপন প্রিয় গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত), ঝুমরা বিবির মেলা’ (১৯৫৩, শারদীয়া ‘আনন্দবাজার’), ‘নারীরত্ন’ (১৯৫৫), ‘মানুষ অমানুষের গল্প’ (১৯৫৯, শারদীয়া ‘দেশ’), ‘আহ্লাদী’ (১৯৬০), ‘মন্ত্র’ (১৯৬১, শারদীয়া ‘দেশ’) ‘ফিরে আসা’ (১৯৬৫), ‘ভারতবর্ষ’ (১৯৬৮), ‘শেষ সংলাপ’ (১৯৭৮), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রমাপদ চৌধুরীর ‘জলরঙ’ গল্পটি ছিল অনগ্রসর উপজাতিদের নিয়ে প্রথম গল্প। মুন্ডা আদিবাসীদের কোলিয়ারি জীবনকে কেন্দ্র করে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে লিখিত হয় গল্পটি। অরণ্য অধ্যুষিত পাহাড়, জল-জঙ্গলে ঘেরা কোলিয়ারি অঞ্চলকে রমাপদ খুব কাছ থেকে দেখেছেন। আদিবাসী মুন্ডাদের কাছে কোলিয়ারী জীবনধারণের একমাত্র উপায়, আর কোলিয়ারীর মুনশী ওদের ভাগ্যবিধাতা। এদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তথাকথিত ভদ্র, শিক্ষিত মানুষেরা তাদের যে কী পরিমাণ নির্যাতন করছে আলোচ্য গল্পে তা পরিস্ফুট হয়েছে। মূলত কোলিয়ারীতে কর্মরত আদিবাসী মুন্ডাদের অসহায়ত্বের দিকগুলি প্রতিফলিত হয়েছে ‘জলরঙ’ গল্পে।

গল্পের শুরুতেই দেখা যায় কোলিয়ারির চাকরি নিয়ে আদিবাসী গ্রামে উপস্থিত হয়েছে বাঙালি বাবু। কয়লা খনি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ জলে ডোবা এক নম্বর খাদটা দেখে কথকের মনে হয়েছে জলে ভর্তি হ্রদ। হরীতকীর বন আর খয়ের গাছের ঝোপ এড়িয়ে শালবনের ফাঁকে ফাঁকে উ'চুনীচু অসমতল পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে উঠতে প্রথমবার সে মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণিকে দেখল। রূপমণিকে দেখে কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়লো তার।

খাদানে পৌঁছে মিশিরজীর থেকে কাজ বুঝে নিতেই জানা গেল পাঁচ নম্বর খাদানের কথা। হলেজের ট্রলি-লাইন ধরে মন্থর পায়ে খাদে নামার সময় চোখে পড়ল আঁকাবাঁকা বিরাট একটা ব্যর্থ দিঘি। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত শুধু শাল-শালাই, আমলকী আর মহুয়ার বন। তারও ওপারে পুবে পশ্চিমে একটি সুদীর্ঘ পাহাড়ের তরঙ্গ। আর সেই শান্ত নিঃশব্দ অরণ্যের মাঝে বেনিয়া সিন্ডিকেটের লুব্ধ কণ্ঠের চিৎকার ফুটে উঠছে হাজারো শাবল আর গাঁইতির কোলাহলে। যতই নিচে নাবা যায় ততই ধাপে ধাপে পৃথিবী যেন নেমে এসেছে নরকের অন্ধকারে। সেই নরকের সিড়ি শেষ হয়েছে কালো কয়লার অন্ধকারে। কোথাও মাটি, কোথাও বা পাথরের প্লটে কাজ চলছে। মালকাটারি রেজা-কুলিদের চেঁচামেচি ভেসে আসছে খাদের গভীর থেকে। কুলিরা গাঁইতির পর গাঁইতি ফেলছে, ছন্দে বাঁধা ধীর পায়ে চলেছে সারি বাঁধা রেজাদের দল। খাড়াই পথ বেয়ে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পিঁপড়ের সারির মতো চলেছে তারা, মাথায় পাথর-বোঝাই ঝুড়ি, পুরুষদের বাঁকের দু পাশে দড়ির ঝোড়া। খাদের এক পাশে মাটি পাথর ফেলে ফেলে নতুন একটা পাহাড় গড়ে তুলছে তারা। আর এখানেই রীতিবিরুদ্ধ একটি খাড়াই পথ বেয়ে ঝুড়ি মাথায় ওপরে উঠতে-নাবতে দেখা গেল রূপণিকে। আর সেখানেই,

> "পাথরের গা থেকে জল পড়ছে চাঁয়ে চু'য়ে, আর একটা জায়গায় ছোট একটি গর্ত কেটে জল ধরে রেখেছে ওরা। রেজা কুলিরা মাঝে মাঝে তৃষ্ণা দূর করে আসছে সেই জলে। কালি-ঝুলি মাখা এই মেয়েটিকেও একটু আগে এক আঁজলা জল খেয়ে আসতে দেখেছি। ওর হাতের সেই ভঙ্গিমাটুকু ভালো লেগেছিলো, মনে হয়েছিলো এমন ভালো লাগার ছবি হয়তো বা আগেও দেখেছি।"[৪]

মিশিরজীর কথায় রূপমণি খাদের রানী। যাকে কেউ কখনো ভুলতে পারে না। এমনকি তার টোকেন দুশো সাঁইত্রিশ নম্বরটিও কেউ ভোলে না। খাদানে, শনিচারীর হাটে মাঝেমধ্যে দেখা হত রুপমণির সঙ্গে। এভাবেই ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল তারা। হঠাৎ একদিন দুপুর বারোটার সময় দুটো ঝুড়ি আর একটা শাবল নিয়ে গোপী সিং এর ডেরায় পৌঁছে দিতে বলেছিলো রূপমণিকে। আদিবাসী মুন্ডা রমণীদের অসহায়ত্ব, ভীরুতা রূপমণির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। ঠিকাদার গোপী সিংয়ের অসৎ উদ্দেশ্য টের পেয়ে তার কথা মতো রূপমণি গোপী সিংয়ের ডেরায় যায়নি বলে তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত হতে হয়েছে। রূপমণির চাকতি নম্বর কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি সুধীনবাবু, উপাধ্যায়কে, গোপী সিং এর কথা বলেও কাজ না হওয়ায় বাঙালি বাবু রূপমণির ভালোবাসার মানুষ পরিয়াগককে কাজ বন্ধ রাখার পরিকল্পনা দেয় যতক্ষণ না রুপমণি কাজে যোগ দেয়। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। রূপমণিকে ধরা দিতে হয় গোপী সিং এর ডেরায়। গল্পের শেষে দেখা যায়, -

> "বিষণ্ণ হাসি হাসলো পরিয়াগ। গোপী সিং ওকে নতুন শাড়ি দিয়েছে বাবু, রূপমণি ওর ডেরাতেই থাকবে।
> দুপুরের শিফ্টে দেখা হল রূপমণির সঙ্গে। নতুন শাড়ি পড়ে হেলেদুলে এসে দাঁড়ালো সামনে।
> বললাম শরম নেই তোর?
> লজ্জায় মাথা নিচু করলে রূপমণি। তারপর ধীরে ধীরে বললে, মুনশীর কত তাকত বাবু, ঠিকাদার মানজার সকলে ওর কথা শুনে। মুনশী চটলে খাবো কি বল্?"[৫]

একজন দয়ালু বাঙালী বাবুকে দুর্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য, পরিয়াগের জীবন রক্ষার জন্য রূপমণিকে গোপী সিংয়ের কাছে হার মানতে হয়েছে। নতুন শাড়ি পরে সে এখন গোপী সিং এর রক্ষিতা হয়ে থাকবে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মেয়ে রেজাদের রাতের শিফটে কাজ করানো নিষেধ। কিন্তু কোলিয়ারীতে মুনশী থেকে ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই সরকারী আইন মানলেও যে জন্য এই আইন বলবৎ হয়েছে, তার ইজ্জত রক্ষা হয় না। তাই প্রভাঙ্গের মুখে শোনা যায় "খাদে এখন রাত পাল্লার ডিউটি দিতে হয় না বটে মেয়েদের, তবে বাবুদের বাংলোয় এখনো..."। এই বক্তব্যে সহজেই তথাকথিত ভদ্রবাবুদের চরিত্র স্পষ্ট হয়। আবার অন্যদিকে আদিবাসী মুন্ডা মেয়েদের চরম অসহায়ত্বের দিকটিও পরিস্ফুট হয়। এই মুন্ডা কোলিয়ারি শ্রমিক নিতান্ত পেটের দায়ে জীবন হাতে রেখে পাতালের অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করে তুলে আনে 'কালো হীরে'। জীবিকার অনিশ্চয়তাই নয় এদের জীবনেরও নেই কোন নিশ্চয়তা। একটু অসতর্ক হলেই খাদানের ধসে কিংবা ডিনামাইটের বিস্ফোরণে যে-কোন সময় প্রাণ হারাতে হয় এদের। শুধু তাই নয়, খনি ম্যানেজার, অফিসবাবু, ঠিকাদার থেকে শুরু করে পাঞ্জাবি মহাজন পর্যন্ত এই সমস্ত কুলি-কামিন, রেজা-মুজুরদের শোষণ করে, এদের মা-মেয়ে-বউদের দিয়ে নিজেদের ভোগ লালসা চরিতার্থ করে। আদিবাসী জনজীবনের দুঃখ, দুর্দশা, অসহায়ত্ব, ভীরুতা, দুর্বলতা 'জলরঙ' গল্পে উপস্থাপিত।

রমাপদ চৌধুরীর 'দরবারী' (১৩৫৮) গল্পটি আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক একটি জনপ্রিয় গল্প। গল্পটি সেই সময় বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। গল্পের শুরুতেই উঠে আসে লাপরার স্টেশন মাস্টার রজনীবাবুর কথা। বরকাকানার জংশন-স্টেশন তখন সদ্য সদ্য ত্রিবেণী হয়েছে। স্টেশন মাস্টার রজনীবাবুর অনুযোগের শেষ ছিলো না, মনে মনে গজরাতেন শুধু, শোনাবার

লোক পেলে বলতেন, এমন স্টেশনই ভাগ্যে জুটলো যে দিনরাত কেবল সবুজ বাতিই দেখাতে হয় ট্রেনগুলোকে, সিগন্যাল নেমেই আছে। সারাদিনে একখানা আপ আর একখানা ডাউন ট্রেন থামে। লাপরায় তখন দিনে দু-চারটে যাত্রী নামতো, দু-চারটে প্যাসেঞ্জার টিকিট কাটতো। তাও থার্ড ক্লাসের। স্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে মুণ্ডা অস্পৃশ্যদের একটা ছোট্ট ডিহি ছিল। একদিন সেকেন্ড ক্লাস কামরা থেকে লাপরা স্টেশনে হঠাৎ করে আগমন হয়েছিল জোনাথন ম্যাকক্লাস্কির, সাঁওতাল পল্লীর সবাই যার নামকরণ করেছিল 'পাগলা সাহেব'। সে রজনীবাবুকে বন্ধু সম্পর্কে আবদ্ধ করে সেখানকার পাথুরে জমিতে ফার্মিং ও আবাদ করার পরিকল্পনা জানায়। রজনী বাবু মনে মনে হাসেন আর ভাবেন দুদিন গেলেই বেচারা সমস্ত তলপিতলফা গুছিয়ে সেখান থেকে রওনা দেবে। কিন্তু জোনাথন মুন্ডাদের সঙ্গে মিশে নেটিভ হবার এবং সহজ সরল মুন্ডাদের নিয়ে বই লেখার স্বপ্ন নিয়ে পাহাড়ের গায়ে বিঘে কয়েক জমি নিয়ে বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি বানিয়ে বাস করতে শুরু করেছিল। পাগলা ম্যাকুসাহেব মুন্ডাদের সঙ্গে মহুয়া খেয়ে আপন করে নিয়েছিল তাদের, মুন্ডাদের মেয়ে শোনিয়াকে ভালবেসে ফেলে সে। দেখা যায়, -

> "শোনিয়াকে সত্যিই একদিন বিয়ে করে বসলো জোনাথন, একেবারে আরণ্যক মতে। মুণ্ডা সর্দার প্রথমটা একটু আপত্তি করবার চেষ্টা করেছিলো। কিল্লীর মিল নেই, নাম গোত্র দূরের কথা একেবারে ভিন দেশের ভিন জাতের লোক, তার সঙ্গে গিতিওড়ার কুমারী মেয়ে শোনিয়ার বিয়ে! কেন, জোয়ানদের গিতিওড়ায় যে আইবুড়ো ছেলেগুলো ঘুমের জন্যে ছটফট করে তাদের একজনকে কি বেছে নিতে পারলো না শোনিয়া? বনজঙ্গল সাফ করবার জন্যে যখন জারা জ্বালানো হয় তখন তো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেও পারতো মেয়েটা।"[৬]

জোনাথনের বিয়ের খবর পেয়ে তার পরিবারের মানুষজন একে একে লাপরার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এক সময়ের অজ সাঁওতালী গাঁয়ে সভ্যতার আলো প্রবেশ করল, লাপরায় গীর্জা হলো, মুন্ডাদের জন্য মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা হলো, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তৈরি হলো ধীরে ধীরে নানা প্রতিষ্ঠান, রেস্ট হাউস, দোকানপাট। লেখক সেখানকার আদিবাসী মুন্ডাদের জীবনযাপন, কুসংস্কার, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদিকে তুলে ধরেছেন। জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি এইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুন্ডাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। দেহাতী অঞ্চল লাপরা উপনগরী হয়ে একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলোনীতে পরিণত হল। কিন্তু জোনাথনের 'মিশন' পূর্ণ হলো না। কারণ, জোনাথন মুন্ডাদের একজন হতে চাইলেও মুন্ডারাই উল্টে ক্রিস্টান হয়ে গেল। কারণ ক্যাসল, ব্রাউনরা সেখানে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন এবং একে একে 'অশিক্ষিত হিদেনদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে' সচেষ্ট হলেন। মুন্ডারা সভ্যতার নানা উপকরণের সংস্পর্শে এলেও তাদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি।

ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা জোনাথন ও সোনিয়ার পরিণয়। কিন্তু জোনাথন বাদে অন্য ইউরোপীয়রা মুন্ডাদের উন্নতি কামনা করে না, ফলে কলোনিতে অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ, জোনাথনের পুত্র ম্যাক ইভা হাগিন্সের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। সমস্ত উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটে জোনাথন ও শোনিয়ার মৃত্যুতে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে সহজ সরল আদিবাসী মুন্ডাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করলেও একশ্রেণীর সাহেবরা যে তাদের খ্রিস্টান মনে করে না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে ব্রাউনের বক্তব্যে "দি মুন্ডাজ, আর ক্রিশ্চানস্ ওনলি ইন নেম্।" শেষ পর্যন্ত রেভারেন্ড ব্রাউন আর আরো পাঁচশো বাসিন্দা পিটিশন পাঠিয়ে অনুমতি চায়, লাপরার নাম বদলে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ করা হোক। অনুমতি আসে। স্টেশনের বোর্ডে লাপরা নাম মুছে নতুন হরফ বসনো হয় ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ। যা দেখে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে রাজীববাবুর।

> "মিস্টার ম্যাকক্লাস্কির জীবনের সবচেয়ে বড় ডিফিট এইটেই। তিনি নিজে লাপরার মানুষ হতে চেয়েছিলেন, মুণ্ডা হতে চেয়েছিলেন। অথচ শেষ পর্যন্ত লাপরাই বদলে গেল।"[৭]

শান্তির দূত বহনকারীদের হিংস্রতার জন্য মানুষে মানুষে সম্পর্ক যে কত তিক্ত হয় এবং জোনাথনের মতো সৎ মানবকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, আলোচ্য গল্পে সেই বিষয়টিকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার।

'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' (১৩৫৯) গল্পে উত্তমপুরুষ কথকের বর্ণনার দ্বারা সাঁওতাল সুরমণির পিতা লাটুয়া ওঝার ওঝা-বিদ্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। সাঁওতাল সমাজগোষ্ঠীর একসময়ের বিশ্বস্ত ও ঈশ্বরতুল্য ওঝার গল্প 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' (১৩৫৯, শারদীয়া আনন্দবাজার)। আদিবাসী সাঁওতালদের এককালীন অন্ধবিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে গল্পটিতে। মরিয়ম এর কথায় গল্পকথক জানতে পারে সেই তল্লাটে লাটুয়া ওঝার মত ওঝা আর একজনও নেই। মুর্দার বুকেও সে প্রাণ বসাতে পারে এমনকি সাপকে মন্ত্র দিয়ে এমন বশ করে যে চুমুক দিয়ে নিজের বিষ নিজেই টেনে নেয়। এমন অবস্থায় গল্পের কথক কুকুরের বিষ পা থেকে নামাতে লাটুয়া ওঝার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। একমাত্র আদিবাসী মুন্ডা, সাঁওতাল জাতির বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর লাটুয়ার বাড়িতে আসা।

বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ী পথ হে'টে ভুরকুন্ডার সারনা পার হয়ে লাটুয়া ওঝার বাড়ির সামনে পৌঁছায় গল্পকথকরা। কাদামাটির দেয়াল-দেওয়া এক টুকরো খাপরার চাল। অন্ধকূপের মতো ছোট একখানি নোংরা ঘর। পচাই মদ আর বাসী ভাতের গন্ধ। চাল থেকে দড়িতে বাঁধা অসংখ্য জিনিসপত্তর ঝুলছে বাদুড়ের মতো। হাঁড়ি, কুমড়ো, বাঁশের চোঙা, তামাক পাতা। ঘরের এক কোণে বসে অন্ধ লাটুয়া ওঝা। বাইশ-চব্বিশ বছরের ওঝার একটি ভরাযৌবনা যুবতী মেয়ে কথকের ঘা পর্যবেক্ষণ করে লাটুয়া ওঝাকে জানাতেই ওঝা ওষুধের সন্ধান দিল,

> "এক কোণে অসংখ্য ছোটবড় কৌটো, হাঁড়ি, মাটির সরা।
> তারই ভেতর থেকে সুরমণি একটা কোঁটো এগিয়ে দিলো লাটুয়াকে।
> "লাটুয়া বললে, ইটা জুড়াং গাছের মূল। চন্দন আর ডুডাং ঘষে তিন দিন লাগাবি কত্তা। বিষ আখন বুকে উঠছে, জুড়াং লাগালি মাটিতে ঝইরবে।
> শিকড়টা হাত বাড়িয়ে নিলাম। সুরমণি খানিকটা ঘষতে শুরু করলো। দেখিয়ে দেবে কি করে লাগাতে হয়।
> শিকড় ঘষার শব্দে লাটুয়া হেসে বললে, আমার মায়েটাও বড় ওঝা কত্তা, সব ঝাড়ফংক শিখ্যে লয়ছে।"[৮]

কথক লাটুয়া ওঝার কাছ থেকে শিকড় সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার শিকড় সংগ্রহ করতে গিয়ে কথকের সামনে লাটুয়া ওঝার মেয়ে সুরমণির দারিদ্র্যের স্বরূপটা সামনে এসে পড়ে এবং সুরমণি স্বীকার করে নেয় যে, তার পিতার মিথ্যা ঔষধ চালানে রোগের নিরাময় ঘটা সম্ভব নয়। এতদিন সে পিতার অগোচরে মিথ্যার জাল বুনে মানুষকে ঠকিয়ে টাকা অর্জন করেছে। তার পিতা লাটুয়া ওঝাও তা জানে না। পরিবারের অভাব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এই ধরনের মিথ্যার ওপর আশ্রয় নিতে হয়েছে সুরমণিকে। একমাত্র অর্থের অভাবে সুরমণির ঠিক করা পাত্রের সঙ্গে বিবাহ আর হয় না। একসময় ডাইনী তাড়ানো, সাপের বিষ নামানো, কুকুরের কামড়ের বিষ নামানো ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে সাঁওতালদের একমাত্র বিশ্বাসের স্থান ছিল লাটুয়া ওঝা ও তার ঔষধ। মানুষের যে-কোনো রোগের নিরাময়ের ঔষধ চালনা করে আরোগ্য লাভের দিশা দেখাত লাটুয়া ওঝা।

সব ছিল লাটুয়া ওঝার! সব রোগের ওষুধ জানতো সে। ডাইনী যুগিন তাড়াতে পারতো, সাপের বিষ ঝাড়তে পারতো। নাগবংশী পুজো দিয়ে সব শিখেছিলো লাটুয়া ওঝা। তারপর একদিন বুড়ো বয়সে জঙ্গলে মূল খোঁজার সময় কখন একটা ভালুক পিছন থেকে এসে জাপটে ধরে তাকে। প্রান বে'চে গেলও কিন্তু ভালুকের থাবার ঘায়ে চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল লাটুয়ার। তখন থেকে আর ঘরের বাইরে যায় না সে। গাছের মূলও শেষ হয়ে গেছে সেসব ওষুধপত্রও শেষ। সেসব গাছের নামও জানে না কেউ, চেনেও না। বুড়ো বাপ দুঃখ পাবে বলে আজেবাজে যা পেয়েছে ঘাস পাতা শিকড় নিয়ে এসে কৌটোগুলোয় সাজিয়ে রেখেছে সুরমণি। কিন্তু আগের মত আর রুগী হয় না, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "রুগী না এলেও রোজ বসে বসে গল্প করে লাটুয়া, কোন ওষুধে কি কাজ হয়, কোনটা কাকে দিয়েছিলো। আর ভাবে, ওর কাছে শুনে শুনে সুরমণিও বড় ওঝানী হয়ে উঠবে।
> কিন্তু লাটুয়া তো জানে না যে সে মূল শেষ হয়ে গেছে। জানে না, চোখ ফিরে পেয়ে গাছগুলো চিনিয়ে না দিলে সুরমণি কিছুই শিখতে পারবে না। তাই দিনের পর দিন শুধু গাপ শোনে সুরমণি। আর গল্প শুনতে শুনতে চোখ ঠেলে কান্না আসে ওর।
> তাই রুগীরাও কেউ আসে না আর, লাটুয়া ওঝার ওষুধে কাজ হয় না' বলে ডাক্তারের কাছে ছুটে যায়।"[৯]

আসলে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে অশিক্ষিত আদিবাসীদেরও মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। তাই তারা লাটুয়া ওঝার কাছে ভিড় না করে ভিড় জমায় হাসপাতালে। আদিবাসীদের পরিবর্তনের এই চিত্রের পাশাপাশি লাটুয় ওঝার জীবনের ট্র্যাজেডিও ধরা পড়েছে। হিংস্র ভালুকের আক্রমণে অন্ধ হয়ে যাওয়া লাটুয়া বনজঙ্গল থেকে আর লতৌষধি খুঁজে আনতে পারে না, তাই সে আজ পরিণত হয়েছে ব্যর্থ ওঝায়। ফলে আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে তার। একজন সফল ওঝার জীবনের ভয়াবহ দিকের পাশাপাশি অশিক্ষিত সাঁওতালদের অন্ধবিশ্বাস ও তাদের মানসিক পরিবর্তনের চিত্রও তুলে ধরেছেন গল্পকার গল্পকার রমাপদ চৌধুরী।

'বিবিকরজ' (১৩৫৯) গল্পকথকের 'আমি'র জবানীতে লেখা ফুলের মত সতেজ, সবুজ, নবীন অনুপমার জীবনের ট্রাজেডি স্থান পেয়েছে। আদিবাসী কামিনদের কোলের শিশুদের জন্য খোলা বেবি- ক্রেশের দায়িত্ব নেবার জন্য কোলিয়ারিতে আগমন ঘটেছিল অনুপমার। বেঁচে থাকার জন্য, দু'বেলা খাবার জোগাড়ের আশায় শিশুদের নিয়েই কোলিয়ারীতে কাজ করতে যেতে হতো আদিবাসী রমণীদের। ক্লান্ত অসহায় সেই আদিবাসী রমণীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে কথক জানিয়েছেন, -

> "হাজরির কাজ সেরে খাদে চক্র দিতে গিয়ে প্রায়ই দেখতাম, অসহায় চোখ-তাকানো ছেলেগুলোকে পিঠে জড়িয়ে রেজারা চলেছে ঝুড়ি মাথায়, খাড়াই পথ বেয়ে। আর বোঝার ভারে দু-পাশে চাপ দেওয়া স্প্রিং-এর মতো কুচকে গেছে তাদের সমর্থ শরীর। ওভারবার্ডেনের ওপর রোদ্দুর-ঝলসানো বালিতে ছে'ড়া চাটাইয়ে পড়ে পড়ে কখনো বা ছেলেগুলো কাঁদতো খিদেয়। দুটো কাঠিতে জড়ানো এক টুকরো নোংরা কাপড় নৌকোর পালের মতো সূর্য আড়াল করতো। কখনো হয়তো সে আড়াল সরে যেতো বাতাসে, কিংবা তাতানো-তাওয়া বালির ওপর গড়িয়ে পড়ে কেদে উঠতো। মুনশীর চোখ আর শরীরের ক্লান্তিকে ফাঁকি দিয়ে কামিন-মা কান্না থামাতো, খিদে মেটাতো শিশুর।"[১০]

কোলিয়ারী জগতের সেই গ্লানি মুছে নেবার জন্যই অনুপমা এসে পৌঁছেছিল তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামী ও শিশুকন্যা মুন্নুকে নিয়ে। অনুপমাকে ঘিরে আদিবাসীদের উৎসাহ দানা বেধেছিল। তাদের মনে হয়েছিল, এসেছে একজন, এসেছে সেই ঝরাপাতার অরণ্যে। শুধু সবুজের শোভা নিয়েই নয়, লাল পলাশের আগুন ছড়িয়ে এসেছে। বেবি-ক্রেচের সমস্ত কুলিকামিন আদিবাসী সন্তানদের দেখাশোনা করত অনুপমা। সঙ্গে থাকতো মেয়ে মুন্নু। বেশ কিছুদিন ভালো কাটলো। কিন্তু কয়েক দিনের পর নেমে আসে অনুপমার জীবনে ট্রাজেডি। কোলিয়ারির এলাকায় মাতব্বর জ্যোতির্ময়বাবু অর্থাৎ জে-পি-সাহেববের কুনজর পড়ে অনুপমার উপর। অনুপমা বুঝতে পারে জ্যোতির্ময়বাবু জেনানার ইজ্জতে হাত বাড়ায়। সে বেবি-ক্রেচে অনুপমার সঙ্গে দেখা করতে আসলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। জ্যোতির্ময় শ্রমিকদের বুঝিয়ে রটিয়ে দেয় অনুপমা সারাদিন মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর কুলিকামিনদের সন্তানরা পড়ে পড়ে কাঁদে নয়তো আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। বিবি-করজে শ্রমিকরা তাদের সন্তানদের রাখতে রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারের নির্দেশে প্যারালাইসিস স্বামীর কাছে দরজা বন্ধ করে মেয়েকে রেখে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু কয়েকদিন পর দরজার ফটো খুলে মুন্নু বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল জেলেরা জলে-ডোবানো এক নম্বর খাদে মুন্নুকে পাওয়া যায়। অনুপমা সেই ঝরাপাতার অরণ্য থেকে সব

সবুজের শোভা নিয়ে, সব ফাগুনের আগুন নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু কথকের স্মৃতিতে অনুপমার স্মৃতি বিরাজমান, -

> "আজও বেবি-ক্রেচের ধার দিয়ে যেতে যেতে অনুপমাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা দুটি উৎকণ্ঠার চোখ, একমুখ ফুলঝুরির হাসি।
> আজও সারা মন অনুশোচনার দৃষ্টিতে খাঁজে বেড়ায় অনুপমাকে।
> হঠাৎ যদি আপনার কানের কাছে কেউ সে নাম ধরে ডাক দেয়, যদি কোনো দিন তাকে খুঁজে পান, কোনো দূরগামী ট্রেনের রাতের কামরায়, কিংবা কোনো জনারণ্য শহরের অন্ধ গলিতে, যদি চিনতে পারেন তাকে, হাতে তার নিঃসঙ্গ সাদা শাঁখা, ব্যর্থ বিষন্ন মুখে দু সারি মুক্তোর চমক, চিবুকে মিলিয়ে যাওয়া ক্ষতের দাগ, বাঁ চোখের নীচে ছোট্ট একটি কালো তিল।"[১১]

অনুপমার জীবনে ট্র্যাজেডির পাশাপাশি কোলিয়ারীতে কর্মরত আদিবাসী কুলি- কামিনদের জীবনযাত্রা, পেশা ও তাদের সরলতা প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে।

'রেবেকা সোরেনের কবর' (১৩৬০) গল্পটিও কোলিয়ারী ও সাঁওতাল জনবসতির জীবনচর্যার কেন্দ্রভূমিতে গড়ে উঠেছে। কারানপুরা কয়লাখনি অঞ্চল এই গল্পের পটভূমি। খনিতে কাজ করা সাঁওতালদের ভিড়ে মাধো সোরেনের মেয়ে রূপমতীর রূপ চোখে পড়ার মতো। শুধু রূপ নয় তার-হাটাচলা, কথাবার্তা থেকে শুরু করে দৃষ্টি চাউনি সবকিছু পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হত। রূপমতী ভালোবাসে লালোয়া কুড়ুখকে। যদিও কারানপুরা কোলিয়ারী এজেন্ট ফার্ণহোয়াইটের বাউন্ডুলে ছেলে ম্যাকুসাহেবের মন কেড়ে নিয়েছে সাঁওতাল কামিন রূপমতী। ম্যাকুকে জড়িয়ে রূপমতির নামে পট্টির বুড়োবুড়ি বলাবলি করছিল। রূপমতীর নামে কুৎসার কানাঘুসা সাঁওতাল সমাজ মেনে নিতে পারেনি। কেননা সাঁওতালরা মনে করে-

> "সাহেব। ও হল আমাদের শত্রুর জাত। চান্দো বোঙা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধর্ম নাই ওদের, তাই সান্তালদের ধর্ম নষ্ট করতে এসেছে ওরা। চান্দো বোঙার কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খিস্টেন করে দেয় ওরা। যেমন করেছে ওই মরিয়ম, সেবাস্তিনা, মেরিয়া, রেজিকে।"[১২]

রূপমতী লালুয়া কুড়ুখের থেকে ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে বেশি হাঁসি-খুশি থাকতো। অথচ রূপমতীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল লালুয়া কুড়ুখের সঙ্গে। তারা স্থির করেছিল দু'কুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমান্ডির খাদানে, দু'জনে মিলে বাসা বাঁধবে। কিন্তু দাঙ্গার অন্ধকারে নিজেকে বাঁচাবার জন্য রূপমতী ম্যাকুর সঙ্গে কিছুক্ষণ অন্ধকারে থেকেছিল বলে পঞ্চায়েত তাকে 'বিটলা'র সাজা শোনায়, যার ফলে পঞ্চায়েতের ভয়ে সাহায্য তো দূরের কথা, দেখা হলে কথাও বলবে না কেউ, জিনিস বেচবে না দোকানী। শুধু বিদ্রূপ আর অত্যাচার, না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরতে হবে তাকে। শুধু তাই নয় গ্রামের মেয়েরা কপাট বন্ধ করে থাকবে, পুরুষেরা দলে দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে ঘিরে ধরবে তাকে, আরেকদল আসবে তীর-ধনুক নিয়ে। অশ্লীল গান আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে তাকে উদ্দেশ্য করে, কেড়ে নেবে লজ্জা নিবারণের যৎসামান্য বস্ত্রখানিও। নিজের স্বজাতির রোষ থেকে বিবস্ত্র রূপমতীকে উদ্ধার করে ম্যাকুসাহেব নিজের বাংলোয় নিয়ে যায়। সাঁওতাল থেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে রূপমতী। অসহ্য ঘৃণা আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রূপমতী রেবেকা নাম নিয়ে ম্যাকুসাহেবের ঘরণী হয়। ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে বিয়ের পর রূপমতীর জীবনে সুদিন এসেছিল। গর্বিত রেবেকা সুখী রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখল। কিন্তু রূপমতীর ভাগ্যে এই সুখ সইল না বেশিদিন। দুর্নীতি প্রমাণে চাকরি হারাতে হল ফার্ণহোয়াইটকে। পিতার বিপন্নতার সাথে সাথে বেকার ছেলে ম্যাকু প্রমাদ গুনলেন। পিতার পরামর্শ মতো ম্যাকু পিতার সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে চলে গেলেন সিলেভিয়ার সঙ্গে বিয়ের জন্য। সিলেভিয়াকে বিয়ে করে মিলবে রেলে চাকরি। রূপমতীকে নিয়ে যাওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ম্যাকু চললেন পিতার সাথে। আর রূপমতী অর্ধাহারে, অনাহারে ম্যাকুর সন্তানকে কোলে নিয়ে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিন গুনল। ম্যাকু আর ফিরে এল না। এরপর প্রাক্তন প্রেমিক লালোয়ার দেওয়া বিয়ের প্রস্তাব

রূপমতী শুধু ফিরিয়ে দিল না, সই সোনামিরুর সহায়তায় খাদানে কামিনের কাজ করে নিজের ও সন্তানের খাওয়ার ব্যবস্থার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে জানায়, -

> "খাদানের কাম? চোখ কপালে তুললো রূপমতী। বললে, আমার না ম্যাকুসায়েবের সাথে বিয়া হইছে। ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত খতম্ করতে চাস তুরা?"[১৩]

ক্ষুধার তাড়নায় রূপমতী দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে থাকে। শেষপর্যন্ত না খেতে পেয়ে রূপমতী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তার আগেই মৃত্যু হয় তার শিশুসন্তানের। মৃত্যুর পর কোন রকমে খ্রিষ্টান নিয়ম মেনে রূপমতীকে কবরস্থ করে একটা সামান্য কাঠের ক্রুশ পুঁতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে খ্রিষ্টান পল্লীর সবাই তাকে ভুলে গেল। ভুলতে পারলো না কেবল লালোয়া কুড়ুখ আর সই সোনামিরু। রূপমতীর বিয়োগ ব্যাথায় লালোয়ার মন আজও কাঁদে নক্সীকাঁথার রূপাই মিঞার মতো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় লালোয়া রূপমতীর কবরের পাশে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যেত। দীর্ঘদিন লালোয়া কুড়ুখ ও সোনামিরুর রূপমতীর কবরের পাশে চুপচাপ বসে থাকা ও প্রদীপ জ্বালানোর দেখাদেখি একে একে সাঁওতাল পল্লীর সকলে এসে রূপমতীর কবরে প্রদীপ জ্বালাতে শুরু করল। ক্রমশ শুরু হল মুরগি বলি, পৌষপর্বের নাচ -

> "ওঁরাও মুণ্ডা সান্তাল হো সবাই মিলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিল রূপমতীর কবর, আরসেই কবরের গায়ে নাম খোদাই করার সময় ঝগড়া বাধল সাদা আর কালো খ্রিস্টানদের মধ্যে। কালো চামড়ার খ্রিস্টানরাই জিতল শেষ অবধি। রূপমতি নয়, রেবেকা ফার্ণহোয়াইট নয়, মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেনের কবর।"[১৪]

সাঁওতাল কন্যা রূপমতীর জীবনের ট্রাজেডি বর্ণিত হয়েছে 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পে। বাংলা সাহিত্যের নব আস্বাদের গল্পটিতে গ্রীক ট্র্যাজেডিসুলভ নিয়তির ক্রীড়া রয়েছে। আলোচ্য গল্পটিতে রমাপদ মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসী অসংস্কৃত সমাজের মানুষের তীব্র কুসংস্কারকে তুলে ধরেছেন।

'সতী ঠাকুরুনের চিতা' (১৩৬০) গল্পটি বাঁকুড়া রায়ের থানে যাত্রাসিদ্ধির প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্তকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। গল্পের প্রত্যক্ষ বিবরণের আড়ালে এক অদৃশ্য কালিতে লিখিত হয় সতীদাহ প্রথার কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য ডোমপল্লীর এক অশিক্ষিত পূজারীর প্রথম বিদ্রোহের প্রয়াস। জেলা বাঁকুড়া, মহকুমা বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর থেকে সাত ক্রোশ পুবে ময়নাপুর, কাঁসারী-দের গ্রাম। গ্রামের এদিকে একখানা ভাঙা পুরোনো বাড়ি, লোকের মুখে-দেওয়ানজীর কাছারি। আশেপাশে আরো কয়েক ঘর বামুন-কায়েতের বাস থাকলেও গাঁয়ের আর সবাই ছিল ডোম। একসময় ডোমপল্লীর নাম হয় পণ্ডিতপাড়া। ডোমপল্লীর ডোমদের যশাই সিদ্ধপুরুষ হয়ে বাঁকুড়া রায়ের উপাসক হয়েছে। তাকে পূজোর কাজে সহায়তা করতে ব্রাহ্মণকন্যা কল্যাণী যেতো ডোমেদের আখড়ায়। কল্যাণীর পিতা অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে একদিন পন্ডিতের মন্দিরে মধ্যরাতে যাওয়া প্রসঙ্গে মেয়েকে ধমক দেয়, -

> "-পণ্ডিত? ক্ষিপ্ত স্বরে চীৎকার করে উঠলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। -শালা ডোম, ভেলকি দেখিয়ে পণ্ডিত হয়েছে। আমার অনুমতি না নিয়ে আর কোনো দিন যাবে না তোমরা, এই বলে দিলাম শেষবারের মতো।
> -যাবো না আর। মৃদু উত্তর এলো।
> কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ভুলতে সময় লাগলো না কল্যাণীর। তা না হলে সারা গাঁয়ে এত কানাঘুষো চললো কেন, ডোমপল্লীতে হাসির হলোড় উঠলো কেন কল্যাণীর নামে!
> সকলেই প্রথম প্রথম লক্ষ করতো, সকালে পুজোয় বসতে দেরি হয়ে যেতো যশাই পণ্ডিতের। কোষাকুষি ধুয়ে ফুল বেলপাতা নেড়ে সময় কাটাতো কেবল। তারপর একসময় স্নান সেরে এলোচুলে এসে হাজির হতো কল্যাণী। সমস্ত শরীরে যৌবনের পুষ্প ফুটিয়ে, মুখে মুক্তোর হাসি দুলিয়ে। পুজোর উপকরণ সাজিয়ে দিতো।"[১৫]

অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে মেয়েকে ধমক দিয়ে কাজ না হওয়ায় মেয়ের ডোমের আখড়ায় যাবার পথ বন্ধ করার জন্য রাতারাতি বিয়ে দিলেন আশি বছরের এক কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যু হলে সহমৃতা হবার জন্য কল্যাণীকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। পাশাপাশি জোড়া চিতা সাজানো হয়ে গিয়েছে। এক পাশে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী। হাত আর পা শক্ত করে বাঁধা তার। মুখের স্বর রুদ্ধ করে আছে কাপড়ের বাঁধন। সতী হবে কল্যাণী। তখনো একদৃষ্টে যশাই পণ্ডিতের আখড়ার দিকে তাকিয়ে আছে কল্যাণী। ওখানে একটা লেলিহান শিখা দুলে দুলে উঠছে আকাশে। যশাই পন্ডিত ছুটে এলেন, কল্যাণীর স্বামীকে জীবিত করবেন তিনি। কিন্তু সারারাত চেষ্টা করেও মন্ত্রের বলে কল্যাণীর স্বামীকে জীবিত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তার ইষ্ট দেবতা বাঁকুড়া রায়ের নিষ্ফলতা অনুভব করে নিরুদ্দেশ হলেন যশাই। বহুদিন পরে যশাই পুনরায় ফিরে এসে দিঘির জলে সমস্ত মূর্তিকে ফেলে দিয়ে বল, -

> “এবার মন্ত্র পড়বো আমি, তোমাদের মধ্যে যে প্রকৃত জাগ্রত ঠাকুর, সে আমার হাতে উঠে এসো।
> এই বলে জলে হাত পেতে মন্ত্রপাঠ শুরু করলো যশাই।
> মুহূর্ত কয়েক পরেই সকলে দেখলে একটি মূর্তি ঠেকেছে যশাই পণ্ডিতের হাতে। মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো। এ যে যাত্রাসিদ্ধি, যাত্রাসিদ্ধির ঠাকুর! আমার বাঁকুড়া রায় কোথায়?
> আবার মন্ত্রপাঠ শুরু হলো। কিন্তু বাঁকুড়া রায় হাতের কাছে উঠে এলো না।
> ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো যশাই। বাঁকুড়া রায় তা হলে মিথ্যা? বাঁকুড়া রায় জাগ্রত নয়? এতদিন তা হলে মিথ্যার পুজো করে এসেছে সে?
> তন্নতন্ন করে খুঁজে বাঁকুড়া রায়ের মূর্তিটা দিঘি থেকে তুলে আনলে যশাই। তারপর লাঠির ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ করলে বাঁকুড়া রায়ের মূর্তি। ইষ্ট দেবতা পরীক্ষিত যাত্রাসিদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করল এবং যাত্রাসিদ্ধির থানে ব্রাহ্মণদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল।”[১৬]

তার আদেশ যে বামুন নিজের জ্যান্ত মেয়েকে জীবন্ত পোড়াতে পারে সে জাত যেন এ মন্ডপে না ঢোকে। যশাই এর বিশ্বাস পরজনমে কল্যাণী আবার এখানে ফিরে আসবে। জনশ্রুতি, প্রচলিত আখ্যান, লোকাচার, কুসংস্কার, ধর্মভীতি প্রভৃতির সমন্বয়ে গল্পটি লিখিত।

‘ঝুমরা বিবির মেলা’ গল্পটিতে আদিবাসী সমাজের অন্ধবিশ্বাসের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সোনাডি গ্রামের তুডুক সাঁওতালরা ডাইনি প্রথায় বিশ্বাসী। গাঁয়ের আদিবাসীরা বিশ্বাস করে ঝুমরা বিবি ও তার মেয়ে আসমিনা ডাইন। ডাইনি সন্দেহে তাদের মারধোর করে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল গ্রামবাসীরা। তারা মনে করে, -

> “নির্মল সিং নয়, আঠারো-বিশ বছরের একটি পর্ণযৌবনা সাঁওতালী মেয়ে। কেউ যেন গলা টিপে মেরেছে তাকে।
>
> গাঁয়ের লোক বললে, ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনা। মায়ের মতো মেয়েও ছিলো ডাইন। নির্মল সিংকে বশ করেছিলো মেয়েটা, লোভ দেখিয়েছিলো, তারপর সুযোগ দেখে কলিজা বের করে খেয়ে নিয়েছে, তাই নির্মল সিং বাতাসে মিশে গেছে। ডাইনরা যখন মানুষের কলিজা খায় তখন আর চিহ্ন রাখে না।”[১৭]

এই অন্ধবিশ্বাসের পাশাপাশি আরেক ধরনের অন্ধবিশ্বাসের চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পে। ডাকাত বুধন কিস্কুর পিতা মিঞ্রা মাঝির অন্ধবিশ্বাস পুত্রের খুনের দায়ে ফাঁসী হলে পিতার কলিজা পুত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে এবং বুধন ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সৎ মানুষ হয়ে উঠবে। বুধন ডাকাতি ছেড়ে চাষবাসে মনোযোগী হবে পিতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিলে মিঞ্রা মাঝি মিথ্যার আশ্রয় নেয়। অন্য একটা মৃতদেহ পুলিশের কাছে নিয়ে গিয়ে বুধনের মৃতদেহ বলে দাবি করে। পুত্রের হত্যার দায় স্বীকার করে তাকে ‘লটকে’ (ফাঁসি) দিতে বলে। কিন্তু ফাঁসির বদলে চার বছর সাজা হলে জেল থেকে বেরিয়ে সে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। গল্পের সমাপ্তিতে দেখা যায়, ঝুমরা বিবি, বুড়ো মিক্স মাঝি সবাই ডাকাত বুধন কিস্কুকে ভুলে গেলেও সোনাডির তুডুক চাষীরা ভুলেনি। তাই, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সোনাডির তুড়ডুক চাষীরা ভোলেনি সে ঘটনা। এখনো শীতকালের দিনে সারা গাঁয়ের লোক মেলা বসায়-ঝুমরা -ঝুমরা বিবির মেলা। মেয়েপুরুষ দিনরাত নাচে গায়, দোকানীদের সারি বসে-মিঠাই, 'মান্ডী', রঙিন কাচের জলচুড়ি। ভিড় ভেঙে পড়ে মোরগ-লড়াইয়ের দিনে। চারপাশের লোক ছড়া বাঁধে, গান গায় ঝুমরা আর মিঞামাঝির নামে। এলা বোঙার পুজো দিয়ে একটা মোরগের নাম দেয় ঝুমরা অন্যটার মিঞামাঝি-তারপর দুজনেরই পায়ে ছুরি বেধে ছেড়ে দেয়।
> যে বছর 'ডাইন' মরে, আনন্দ ধরে না আর গাঁয়ের লোকের। আর যেবারে 'মিঞামাঝি' রগটার চোট লাগে, সেবারে এলা বোঙার পুজো চলে সাত দিন ধরে।"[১৮]

প্রচলিত আখ্যান, স্থান-কাল, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণে রমাপদ গল্পের অবয়ব নির্মাণ করেন। আদিবাসী সমাজে লোক-উৎসবের অন্যতম একটি ঐতিহ্য হল মোরগ লড়াই। যে-কোনো মেলা-পরবকে কেন্দ্র করে মোরগ-লড়াই আয়োজন করে আদিবাসী সমাজের মানুষেরা। এই উৎসব থেকে বিশাল আনন্দ অনুভব করে তারা। রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পে মোরগ-লড়াইয়ের দৃশ্য তুলে ধরেছেন।

'নারীরত্ন' (১৩৬২) গল্পটি একরামপুর জঙ্গলের থানা-হাকিম সুধীরবাবুর মুখে শোনা গল্প কথকের লেখনীতে বর্ণিত হয়েছে। গল্পে অবৈধ প্রেমিক ধুলনকে বাঁচাতে আদিবাসী ময়না কিস্কু তার স্বামী ভুখন কিছুকে খুন করে। অথচ ময়নার অনুরোধে ধুলন যখন মৃতদেহ সোনা তুলসী নদীর জলে ফেলতে রাজি না হয়, তখন নিজেকে বাঁচাতে ময়না কৌশলে দরজা বন্ধ করে ধুলনকেই মিথ্যে খুনের অপরাধে ফাঁসিয়ে দেয়। নিজেকে বাঁচাতে ধুলন ঘরের চাল ছেদ করে পালালেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। খুনের দায়ে ধুলনের ফাঁসি হয়ে যাওয়ার বেশ কিছু দিন পরে ময়নার মেয়ে, মায়ের নিষ্ঠুরতায় ও ডাইনি সন্দেহের ভয়ে আসল সত্য দারোগা সুধীরবাবুকে খুলে বলে। সুধীরবাবু অনুমান করেন ধুলন হয়তো সত্যি সত্যি ময়নাকে ভালোবাসতো। সেই ভালোবাসার নারীই যখন তাকে মিথ্যা অপরাধে ফাঁসাতে চাইলো তখন অভিমানি প্রেমিক মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করলো।

> "যাকে সত্যিই ভালোবাসি, সে যখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চায়, তখন মৃত্যু কামনা করাই তো স্বাভাবিক।"[১৯]

এই গল্পের ময়না আত্মসুখসর্বস্ব ভোগী নারী। জীবনকে অপরিসীম মমতায় ভালোবেসেছে বলেই আপন অপরাধের দোষ প্রেমিকের উপর চাপিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। আত্মসুখসর্বস্ব ভোগী মানুষ আপন স্বার্থে যে কতখানি নীচে নেমে যেতে পারে এই গল্প তারই প্রমাণ।

'মানুষ অমানুষের গল্প' (১৩৬৬) এর শুরুতেই "হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর মার, হা-লা-লা-লা বান্দর মার" চিৎকার করতে করতে বাঁদর মারার দল গ্রামে ঢোকে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় বাঁদরমারাদের দল। গ্রামবাসীদের আখের ক্ষেত, জমির ফসল, সব্জির ক্ষেত নষ্ট করে যে বাঁদরগুলো সেই বাঁদরগুলোকে মারার জন্য টাকা আর গামছার চুক্তি হয় গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে। আলোচ্য গল্পে পশুদের মানুষের সমগোত্রীয় করে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

কিছু দিন ধরেই বাঁদরদের উৎপাত নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছিলো শাঁখাভাঙার লোকেদের মধ্যে। পথে মোড়ল দেড় বিঘে জমিতে বেগুনের চারা বসিয়েছিলো। যখন বেশ একটু ডাগর হয়েছিলো চারাগুলো তখন একদিন দেখলে সব ছত্রাকার করে দিয়ে গেছে। শাক-সবজি করতে দেবে না, লাউ- কুমড়ো হতে দেবে না, আখের ক্ষেতে ঢুকে মটমট করে ভেঙে দিয়ে যায় সব। শুধু কি তাই, কারো উঠন থেকে কাপড় নিয়ে পালায়, বারান্দায় বড়ি শুকোতে দিলে ঘেঁটে দিয়ে যায়, গাড়ুটা-হাঁড়িটা এর বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে অন্যের বাড়িতে ফেলে দেবে। পথে মেয়ে-বউ দেখলেই তাড়া করে। ছোট ছেলেপিলে সামনে গেলেই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে যায়। গ্রামের সবাই যখন অতিষ্ঠ মোড়ল জানায় বাঁদর-মারাই আনতে হবে। কিন্তু তাতে সায় ছিল না অকলঙ্ক ভট্টাচার্যের। শেষ পর্যন্ত নগদ সাত টাকা ও দুজোড়া গামছার বিনিময়ে আদিবাসী বাঁদর মারার

দল গ্রামে উপস্থিত হয়। বকুল গাছের তলায় ধরানো আগুনে স্বীকার করা ইঁদুর ও খট্টাশ গুজে দেয় আহারের জন্য। লারী, টিকালী আর রচ্চনরা সাতটা লোক নিয়ে একটা দল। ভোর হতেই ওরা এসে ঢুকলো গাঁয়ের মধ্যে। চারপাশ থেকে তাড়া খেয়ে মাঠের গাছ থেকে লাফাতে লাফাতে বাঁদর- গুলো এসে জোটে গাঁয়ের মধ্যে। তাড়া খেয়ে আম গাছে লুকিয়ে থাকা একটি বানর ও শাবককে ধরে ফেলে টিকালী আর রচ্চন। বাঁদরের অসহায় অবস্থা দেখে অকলঙ্ক ভট্টচায এগিয়ে এসে, চাটুজ্যে আর পথে মোড়লের উদ্দেশে বললেন, -

> "আহা, অমন করে হত্যা কোরো না ওদের। বানর নয় হে ওরা, মানুষ। অভিশপ্ত মানুষ ওরা। দেখছো না, মানুষের মতো কেমন বুকে জড়িয়ে রেখেছে ছেলেটিকে।"[২০]

কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, ধাড়ীটা ছুটে এসে বসল তার সামনে, ঠিক মানুষের মত দুটি হাত জোড় করে দুটি করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। কিচকিচ করে কি যেন বলতে চাইল বাঁদরটা। কিন্তু তার আগেই বাঁদরমারাদের একটা তীর এসে লাগল ধাড়ীটার বুকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেই ছটফট করতে শুরু করলো বাঁদরটা। তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রক্তে ভিজে গেল অকলঙ্ক ভট্টাচার্যের পায়ের তলার মাটি। দু'চোখ বেয়ে জল নামল তার। নিজের শিশুকে বাঁচাবার জন্য গল্পে বাঁদরের মায়ের আকুলতা যে কোনো মানব মায়ের তার শিশুর জন্য আকুলতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। পারিশ্রমিক হিসাবে পাওনাগণ্ডা আদায় করে নিয়ে বাঁদর মারার দল নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এখানে টিকালী চরিত্র দর্পণের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রিদে আর টিকালীর যৌন সম্পর্কের যে ছবি লেখক আভাসে ইঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন তাতে নারী-পুরুষের আদিম সম্পর্ক চিত্রায়িত হয়েছে।

আদিবাসী বাঁদর মারা দলের পেশা, জীবনযাপন, হিংসা, যৌনতা ইত্যাদির পাশাপাশি পশুদের উপর মানুষের অত্যাচার ও সমবেদনার একটা মর্মস্পর্শী ও হৃদয় আকুল করা ছবি গল্পে প্রকাশিত। যুগসচেতন লেখক তাঁর শিল্পপ্রতিভার দ্বারা এক অনবদ্য গল্প বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

'মন্ত্র' (১৩৬৮) গল্পে পাহাড়ী, সাঁওতাল শ্রেণির অশিক্ষিত মানুষের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন রমাপদ চৌধুরী। গল্পে লালচাঁদ ওঝার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তন্ত্র, মন্ত্র, ঝাড়ফুঁকের প্রতি সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের অন্ধবিশ্বাস এতে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামে জনশ্রুতি লালচাঁদ রোজা বিষধর সাপের বিষ ঝেড়ে নামিয়ে মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে। কিন্তু জনশ্রুতি, অপার বিশ্বাস বিফলে গেল যখন লালচাঁদের জড়িবুটি, তন্ত্র, মন্ত্র, নিমের ডালের ঝাড়ন কোন কিছুই গল্প কথকের সাপে কাটা দিদিমাকে বাঁচাতে পারলো না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন যুক্তি দিয়ে তর্ক বিচার না করে শুধু পরম্পরাজনিত একটা অন্ধবিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। নদী-নালা-ঝোঁপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই বাংলাদেশে সাপের আনাগোনা বেশি। কিন্তু সব সাপই বিষধর নয়। মেশিন কোন এক সাপের কামড় দেওয়া রোগীকে কোন একদিন লালচাঁদ বাঁচিয়ে দিয়েছিল তার মন্ত্রের বলে। কিন্তু কথকের দিদিমাকে যথার্থই বিষধর সাপে কাটল, তখন ওঝার তন্ত্র-মন্ত্র কোনো কাজ দিল না। রোগীকে বাঁচাতে না পেরে হতাশ হয়ে লালচাঁদ ফিরে গেলেও তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি আজন্ম বিশ্বাসে তার এতোটুকু আঘাত পড়েনি। কান্ত বেদের মেয়ে পার্বতীও বৃদ্ধ লালচাঁদের তন্ত্র-মন্ত্রে এতই বিশ্বাসী যে তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু পার্বতী অন্যান্য মানুষেরা লালচাঁদের তন্ত্র-মন্ত্রের উপর যত আস্থাই রাখুক না কেন, খোদ লালচাঁদের বিশ্বাসই যেন শেষ অবধি ফাটল ধরেছিল। আজন্মলালিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস মানুষকে যে কতটা নিরুপায় করে তুলতে পারে, তাই প্রমাণিত হয় গল্পের শেষে লালচাঁদ রোজার আচরণে। নিজের স্ত্রী পার্বতীকে সাপে কামড়ালে হাসপাতালে যাবার পরিবর্তে বিষহরির প্রতি স্থির বিশ্বাসের কথাই সে বলে। ঠাকুর-দেবতার প্রতি অন্ধভক্তি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার মানুষের জীবনে যে কি ভয়াবহ পরিণতি ঘনিয়ে আনে, 'মন্ত্র' গল্পটির শেষ সংলাপে কথকের উক্তিতে লাল চাঁদের বক্তব্য, -

> "অনেক তো মেরেছিস টাকা রোজগারের জন্যে, বউটাকে অন্তত বাঁচা।
> শুনে হাসলো লালচাঁদ। তারপর ঝোলা থেকে জড়িবুটি শিকড়বাকড় বের করতে করতে বললে, মা বিষহরীর মন্তর কখনও মিছা হয় গো বাপ, লাগবন্দী বিষ লামানোর মন্তর কখনও মিছা হয়।

> বলে বিষপাথরে একটা শিকড় ঘষতে শুরু করলো।"[২১]

'ফিরে আসা' (১৩৭২) গল্পটিতে রমাপদ চৌধুরী আদিবাসী মানুষের জীবিকা রূপে কৃষিনির্ভরতা এবং বনভূমি-নির্ভরতা জীবনকে দেখিয়েছেন। গল্প কথকের বাচনভঙ্গিতে শুঁড়গি পাহাড়ের কানিয়ালুকা গ্রামের আদিবাসী মানুষের কৃষিকাজ ও পশুপালন-নির্ভর জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে ফিরে আসা গল্পটিতে। গল্পকথক তাঁর তিনবন্ধুসহ, ছোটু প্রধান ও ভাটিখানার মেনুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে গেস্ট হাউস থেকে আদিবাসী কানিয়ালুকা গ্রাম পরিদর্শনে বের হয়। তখনই তাঁদের রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমিতে আদিবাসীদের ফসল ফলানোর দৃশ্য চোখে পড়ে। এই অবস্থায় তাঁরা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার আদিবাসীদের পালিত একটি ছাগল ছানাকে গাড়ির তলায় চাপা দেন। বরেন বলে ওঠে ওটা কেবল ছাগল, অন্য কিছুই নয়। দ্রুত তারা সেই স্থান ত্যাগ করে কিন্তু বারবার মনে হতে থাকে সড়কি টাঙি নিয়ে তেড়ে আসছে। বেশ খানিকটা এসে একটা ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম দেখে তবেই আশ্বস্ত হলো তারা, -

> "একটা জঙ্গল-চৌকি ঘিরে কয়েকটা মাটির ঘর। লম্ফ হাতে একটা সাঁওতাল মেয়ে একটা ঘর থেকে অন্য ঘরে গেল।
> সুনন্দ একটা চিমটি কাটলো।
> মৈনুদ্দিন চুপচাপ বসে ছিলো, বললো, বাঁয়ের রাস্তা নদীর দিকে গেছে।
> অবিনাশের হয়তো থামার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু থামতে পারলো না। শুধু বললো, ধুৎ, মিছিমিছি আসা।"[২২]

সন্ধের সময় গ্রামের মানুষ তামার খনিতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে আসে। গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে মৃত ছাগলটাকে রাস্তার ওপর রেখে পথ অবরোধের মাধ্যমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এই আদিবাসী গ্রামের একই রাস্তা দিয়ে গল্পকথকসহ পাঁচ যাত্রী গাড়িতে করে ফেরার সময় তাদের বিক্ষোভের সামনে পড়ে। তাঁরা ছাগলের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দশ টাকা গ্রামের মোড়লের হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে আদিবাসী মানুষেরা টাকা নেওয়ার পর মানবিকতার পরিচয় স্বরূপ ছাগলটা গল্পকথকদের ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানালে তা কিন্তু তাঁরা গ্রহণ করে না। বরং কথকরা আদিবাসীদেরকেই উপহার স্বরূপ ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে গল্পকথকসহ তাঁর তিন বন্ধু আদিবাসী মানুষের মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় পেয়ে অবাক হন। এভাবেই পরম্পরা আদিবাসী মানুষেরা নিজেদের শান্ত, নিরীহ ও সৎ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে এসেছে দিকু কিংবা বহিরাগত মানুষের কাছে। এমনকি পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই ছোট মিঞার পাঠানো ভেট পেয়ে তারা অবাক হয়েছে।

'ভারতবর্ষ' (১৩৭৫) রমাপদ চৌধুরীর একটি বিখ্যাত ছোটগল্প। একটি জনজাতি, এ গল্পে প্রোটাগনিস্ট তাকেই 'ভারতবর্ষ' বলেছেন। মাহাতোগাঁয়ের কালো কালো মানুষগুলো কীভাবে ভিখারি হয়ে গেল তার বর্ণনা রয়েছে গল্পে। গল্পের শুরুতেই জানা যায় যেখানে, -

> "স্টেশন ছিল না, ট্রেন থামত না, তবু রেলের লোকদের মুখে মুখে একটা নতুন নাম চালু হয়ে গিয়েছিল। তা থেকে আমরাও বলতাম 'আন্ডা হল্ট'।
> আন্ডা মানে ডিম। আন্ডা হল্টের কাছ ঘে'ষে দুটো বে'টেখাটো পাহাড়ী টিলার পায়ের নীচে একটা মাহাতোদের গ্রাম ছিলো, গ্রামে-ঘরে মুর্গি চরে বেড়াতো। দূরে, অনেক দূরে ভরকুণ্ডার শনিচারী হাটে সেই মুর্গি কিংবা মুর্গির ডিম বেচতেও যেতো মাহাতোরা।"[২৩]

এই আন্ডা হল্ট নিয়ে রমাপদ চৌধুরীর গল্প 'ভারতবর্ষ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে এবং কখনও কখনও শুধু আমেরিকান সৈনিকদের নিয়ে মাঝে মাঝে ট্রেন যেত মাহাতোদের গ্রামের পাশ দিয়ে। লাইনের দু'পাশে কাঁটাতারের বেড়া। ভোরবেলা সেই ট্রেন হল্টে থামলে ব্রেকফাস্ট হিসেবে সৈনিকদের দেওয়া হ'ত সেদ্ধ ডিম। রাশি রাশি ডিমের পরিত্যক্ত খোসা জমত লাইনের পাশে কাঁটাতারের ওপর মাহাতোদের গ্রামের পাশে। সেই থেকে নাম হ'ল আন্ডা হল্ট।

গল্পের বাঁক বদল ঘটল যেদিন দেখা গেল মাহাতো গ্রামের এক নেংটিপরা ছেলে কোন সাহসে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের ডিম রুটি কফি খাওয়া দেখছে। এখানে লক্ষ্য করা গেল একদিকে লেখক নির্জন এক হল্ট স্টেশনের আবহ নির্মাণ করেছেন। একদিকে রেললাইন, লালশালু উড়িয়ে ট্রলির চলে যাওয়া, ঠিকাদার, বেহারি কুক, সার্ভার কুলি, মার্কিন সৈনিকদের দল এসবের প্রয়োগে নির্মিত হয় ধাতব, স্বাভাবিক মনুষ্যস্পর্শরহিত নির্জন যান্ত্রিক এক আবহ। তার বিপরীতে ক্রমে রেললাইনের পাশে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে জমা হতে থাকে মাহাতো গ্রামের মানুষজন। ওদের নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে দূর থেকে দেখা এই ট্রেনের আসা যাওয়া, মার্কিন সৈন্যদের ডিম রুটি খাওয়া, এসবই ছিল নতুন এক দৃশ্য। প্রথমে শুধু কৌতূহল ভরেই ওরা দেখত এই আশ্চর্য দৃশ্য। আর কিছু নয়, কোনও প্রত্যাশা নয়, কোনও লোভ ছিল না ওদের চোখে। এই আশ্চর্য চলমানতা দেখবে বলেই সহজ সরল মানুষগুলো এসে দাঁড়াত কাঁটাতারের বেড়ার পাশে।

একদিন এক সৈনিক তার হিপ পকেট থেকে চকচকে একটা আধুলি বার করে ছুঁড়ে দিয়েছিল কাঁটাতারের ওপারে। সবাই অবাক হয়ে সৈনিক ও আধুলিটির দিকে তাকিয়ে রইল। কাঙালের মত খাবার বা বকশিসের লোভে মাহাতোগাঁয়ের মানুষ এসে সেখানে দাঁড়াত না। শুধু কৌতূহল ছিল ওদের চোখে। ট্রেন এলেই ছুটে দেখতে আসত। ওদের ছিল খেতির কাজ, পরিশ্রমের ফসল তুলত ওরা। ওদের ছিল মুরগির লড়াই, গলায় লালসুতোয় ঝোলানো দস্তার তাবিজ, পুতির মালা। ছিল ধামসা মাদল, মহুয়া বন, আদিম সঙ্গীত। সাহেব বকশিস দিয়েছে শুনে ওরা উল্লসিত হয়নি। নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল। লেখকের মতে পয়সাটি ছুঁড়ে দেওয়া ছিল ওদের কাছে বিস্ময়, একটা ধাক্কা, হয়তো অপমানও। সহজ সরল যে বিশ্বাস নিয়ে ওদের জীবনযাপন, সেখানে এই লোভের হাতছানি, বকশিস বড় বেমানান। বিস্মিত হয়েছিল ওরা। তারপর একদিন একমুঠো আনি, দোয়ানি ছুঁড়ে দিয়েছিল এক সৈনিক মাহাতোগ্রামের মানুষদের দিকে। দু'টো বাচ্চা ঝাঁপিয়ে পড়ল পয়সা কুড়োতে। মাহাতোবুড়ো খবর্দার চিৎকার করে সাবধান করেছিল। বাচ্চাদু'টো শোনেনি, যতটা পেরেছে পয়সা কুড়িয়ে নিয়েছে। মাহাতোবুড়ো কী সব বলে যাচ্ছিল আর হাসছিল মাহাতোগ্রামের সবাই। পালটে গেল ধরম-করম, বিশ্বাস, রীতরেওয়াজ। ভেঙে গেল তাদের ব্রতকথা, মঙ্গলকাব্য, লক্ষ্মীর আলপনা। তাদের দিকে নেমে আসে রঙিন ছবি।

এভাবে কখনও আমেরিকান সৈন্য-বোঝাই ট্রেন, কখনও ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াত। কাঁটাতারের ওপাশে মাহাতোগ্রামের সমস্ত লোক এসে দাঁড়াত হাত বাড়িয়ে। একদিন কথক দেখলেন 'সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতোবুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে — সাব বকশিস, সাব বকশিস।' উন্মাদের মত, ভিক্ষুকের মত। গল্পের শেষে দেখা গেল যেদিন মাহাতোবুড়োও ভিখারি হয়ে গেল, সেদিন আর ট্রেন থামল না। আর কোনও দিনই থামেনি। মাটি আর অরণ্যের সহজ মানুষগুলোকে ভিখারি বানিয়ে ট্রেন চলে গিয়েছিল। চিরকাল এই ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়। যারা বিক্রি হতে চায় না, যাদের শিরদাঁড়া শক্ত, যেভাবে হোক, তাদের ভিখারি বানিয়ে দাও। জগৎজুড়ে ভোগবাসনার রঙিন সুখের স্বপ্ন দেখাও। সব কেনা যায়। তারপর কেনা হয়ে গেলে আমরা আর ট্রেন চালাব না। সবাইকে ভিখারি না বানালে আমাদের রাজ্যপাট চলবে কেমন করে। পয়সা তোমাকে তুলতেই হবে। মানুষকে ভিখারি বানানোর এ এক আশ্চর্য গল্প। গল্পের শেষবাক্যে মর্মন্তুদ আত্মযন্ত্রণাজাত বেদনাকেই বাঙ্ময় করে তুলেছে -

> "ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতোগাঁয়ের সবাই ভিখারি হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব-সব ভিখারি হয়ে গেল'।"[২৪]

অরণ্য ও খনিজ অধ্যুষিত ঝাড়খন্ডের রাঁচি, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ এবং ছত্তিশগড়ের বিলাশপুর সন্নিহিত অঞ্চলে জীবনে অনেকটা সময় কাটিয়ে আসা রমাপদ চৌধুরীর গল্পে অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে ঐ সমস্ত অঞ্চলের মানুষজনের সুখ-দুঃখের কাহিনি। শুধুমাত্র আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক বা অনগ্রসর উপজাতিদের নিয়ে রমাপদ চৌধুরী গল্প লেখেননি। তাঁর গল্পের বিষয় বৈচিত্র্যে ভরা। অবশ্য একাধিক বিষয় নিয়ে তিনি গল্প রচনা করলেও তাঁর গল্পের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে আদিবাসী অসহায় মানুষগুলির কথা। আদিবাসীদের কৃষিকাজ স্বল্পমজুরির বিনিময়ে শ্রমদান, লৌকিক দেব-দেবীর উপর আস্থা রাখা, ঝাড়ফুঁক ওঝা বিদ্যায় বিশ্বাসী, ডাইনি বিদ্যার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, ধর্মান্তরের মাধ্যমে আধুনিক জীবনকে বরণ, আদিবাসী কেন্দ্রিক নানা কুসংস্কারের শাস্তি স্বরূপ বিতাড়িত হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি রমাপদ চৌধুরী তুলেছেন নিখুঁতভাবেই। উল্লেখিত

গল্পগুলি ছাড়াও রমাপদ চৌধুরীর আদিবাসী কেন্দ্রিক আরো কিছু গল্প থেকেই যায় যা মূলত অসহায় মাটির কাছে থাকা মানুষগুলির জীবন যন্ত্রণা, সমাজ সংস্কৃতির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

Reference:

১. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, 'বাংলাদেশের নাটক আদি-নৃগোষ্ঠীকথা', সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত "উলুখাগড়া" সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, বর্ষা ১৪১৩, পৃ. ২২১

২. জানা, স্মরজিৎ, 'সমাজ-সমস্যার সাত সতেরো', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দুর্বার প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২০-২১

৩. 'দেশ', ৭ জানুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ. ৬৩

৪. চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ২২৩

৫. চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ২২৬

৬. চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১৯৬

৭. চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ২০৩

৮. তদেব, পৃ. ২৪০

৯. তদেব, পৃ. ২৪৩

১০. তদেব, পৃ. ২৩৪

১১. তদেব, পৃ. ২৩৮

১২. তদেব, পৃ. ২৭৯

১৩. তদেব, পৃ. ২৮২

১৪. তদেব, পৃ. ২৮৪

১৫. তদেব, পৃ. ২৯৪

১৬. তদেব, পৃ. ২৯৮

১৭. তদেব, পৃ. ৩০০

১৮. তদেব, পৃ. ৩০৫

১৯. তদেব, পৃ. ৩২৪

২০. তদেব, পৃ. ৩৯৩

২১. তদেব, পৃ. ৪৬৩

২২. তদেব, পৃ. ৫২৩

২৩. তদেব, পৃ. ৫৭৩

২৪. তদেব, পৃ. ৫৭৮